سورة الدهر

সূরা দাহর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩১ আয়াত, ২ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا
۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَ
يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ
وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢
مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا
۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥ قَوَارِيْرَا
مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ
ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ
وَّإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوٓا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾
إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
اٰثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ الَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ
وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَآءُونَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمِيْنَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে---এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সৎ কর্মশীলরা পান করবে কাফূর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ

পান করবে---তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (৯) তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (১২) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকি থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্র (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে---পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনিমুক্তা। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যেকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাত্রির কিছু অংশে তার উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তার রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না---বীর্য ছিল, এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুষ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

নর ও নারী উভয়ের বীর্য থেকে। কেননা, নারীর বীর্যও ভিতরে ভিতরে তার গর্ভাশয়ে স্খলিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশয়ের মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও ভিতরে থেকে যায়। মিশ্র বীর্যের আরেক অর্থ এই যে, এই বীর্য বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি) এভাবে যে, তাকে আদিষ্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন (সমঝদার) করে দিয়েছি। (বাকপদ্ধতিতে সমঝদার বুদ্ধিমানকেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান বলা হয়। তাই আদিষ্ট হওয়ার যে ভিত্তি সমঝদার হওয়া; তা এখানে উল্লিখিত না হলেও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিষ্ট হওয়ার গুণাবলীসহ সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালমন্দ জ্ঞাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অকৃতজ্ঞ (ও কাফির) হয়েছে অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলের প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি। (আর) যাঁরা সৎকর্মশীল তাঁরা এমন পানপাত্র (অর্থাৎ পানপাত্র থেকে শরাব) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফূর অথবা এমন ঝরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাগণ পান করবে এবং যাকে (তারা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। (জান্নাতের ঝরনাসমূহ জান্নাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কারামত। দুররে মনসূরে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের হাতে স্বর্ণের ছড়ি থাকবে। তারা এসব ছড়ি দ্বারা যে দিকে ইশারা করবে, সে দিকে ঝরনা প্রবাহিত হবে। জান্নাতের কাফূর শুভ্রতা, শীতলতা, চিত্তবিনোদন ও বলবীর্য বর্ধনে অতুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক উপযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জান্নাতের শরাবে কাফূর মিশ্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট ঝরনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতএব এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই বাহুল্য। এতে করে সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরদার হয়ে যায়। যদি ابرار ও عباد الله বলে একই শ্রেণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে দুই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জায়গায় মিশ্রণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জায়গায় তার আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়ত্তাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলা। অতঃপর সৎকর্মশীলদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে ঃ) তারা মানত পূর্ণ করে (আন্তরিকতা সহকারে, কেননা) তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা হবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতায় পড়বে। এখানে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আর্থিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আন্তরিকতা কম থাকে---তারা আন্তরিক। সেমতে) তারা আল্লাহ্‌র প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে শুভ কাজ, তা বর্ণনা-সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

দেওয়াও শুভকাজ। তারা আহার্য দিয়ে মুখে অথবা অন্তরে বলে ঃ) কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (মৌখিক) কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (কেননা) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভয়ংকর ও তিক্ত দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের বদৌলতে সেদিনের তিক্ততা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকব। এ থেকে জানা গেল যে, পরকালের ভয়ে কোন কাজ করা আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থী নয়)। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে (এই আনুগত্য ও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (অর্থাৎ মুখমণ্ডলে সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং তাদের দৃঢ়তার প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা তথায় (অর্থাৎ জান্নাতে) আরাম কেদারায় (আরামে ও সসম্মানে) হেলান দিয়ে বসবে। তারা তথায় রৌদ্রতাপ ও শৈত্য অনুভব করবে না (বরং আনন্দদায়ক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হবে)। সেখানকার (অর্থাৎ জান্নাতের) বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে। ছায়া অন্যতম বিলাস উপকরণ। জান্নাতে চন্দ্র-সূর্য নেই। অতএব, ছায়ার মানে কি ? জওয়াব এই যে, সম্ভবত অন্যান্য জ্যোতির্ময় বস্তু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই বোধ হয় ছায়ার উপকারিতা। কেননা, এক অবস্থা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, অবশেষে তা থেকে মন ভরে যায়)। এবং জান্নাতের ফলমূল তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (ফলে সর্বক্ষণ সর্বভাবে অনায়াসে তা গ্রহণ করতে পারবে) তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌঁছানোর জন্য) রূপার পাত্র পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপাত্র। এটা হবে রূপালী স্ফটিক—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরিমাপ করে ভর্তি করা হবে যে, অতৃপ্তি না থাকে এবং উদ্বৃত্তও না হয়। কারণ, উভয়ের মধ্যেই বিতৃষ্ণা রয়েছে। রূপালী স্ফটিকের অর্থ এই যে, রূপার মত শুভ্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পার্থিব রূপা স্বচ্ছ নয় এবং স্ফটিক শুভ্র নয়। সুতরাং এটা এক অভূতপূর্ব বস্তু হবে। তথায় তাদেরকে (উল্লিখিত কাফূর মিশ্রিত শরাব ব্যতীত আরও) এমন পাত্র-পান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। (উত্তেজনা সৃষ্টি ও মুখের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন ঝরনা থেকে (তাদেরকে পান করানো হবে) যার নাম (সেখানে) সালসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ঝরনার শরাবে কাফূরের এবং এই আয়াতে বর্ণিত ঝরনার শরাবে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। এর রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব বস্তু নিয়ে) চির কিশোর বালকরা ঘোরাফেরা করবে (তারা এমন সুশ্রী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্ষিপ্ত মণিমুক্তা। (পরিচ্ছন্নতা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং চলাফেরার দিক দিয়ে বিক্ষিপ্ত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উল্লিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য এত অধিক ও উচ্চমানের থাকবে যে) হে পাঠক, যদি তুমি সেই স্থানটি দেখ, তবে তুমি অগাধ নিয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের (অর্থাৎ জান্নাতীদের) আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশমী বস্ত্র ও

মোটা রেশমী বস্ত্র। (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আনন্দ রয়েছে)। তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকন। (এই সূরার তিন জায়গায় রূপার আসবাব-পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপত্র থাকবে। এর রহস্য বিলাসব্যসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি নযর রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দূষণীয় বলে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দূষণীয়, পরকালেও তা দূষণীয় হবে---এটা জরুরী নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবেন, তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপবিত্র, বিবেকবুদ্ধি বিলোপকারী ও নেশাযুক্ত হবে না বরং আল্লাহ্ তা'আলা) তাদেরকে শরাবান-তহুরা (পবিত্র শরাব) পান করাবেন। এতে নাপাকী ও ময়লা থাকবে না; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ সূরার তিন জায়গায় শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জায়গায় يَشْرَبُونَ দ্বিতীয় জায়গায় يُسْقَوْنَ এবং তৃতীয় জায়গায় سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম জায়গায় সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় জায়গায় সসম্মানে পান এবং তৃতীয় জায়গায় চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়-বস্তুর বারবার উল্লেখ হয়নি। এসব নিয়ামত দিয়ে আত্মিক সুখ বৃদ্ধি করার জন্য জান্নাতী-গণকে বলা হবে ঃ এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের শাস্তি আপনি শুনলেন। অতএব, এ শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও প্রচারকার্যে মশগুল থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্তরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই ঃ] আমি আপনার প্রতি অল্প অল্প করে কোরআন নাযিল করেছি (যাতে অল্প অল্প করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে পারে ; যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে ঃ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিষ্ঠ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য গুরুত্ব প্রকাশ করা। নতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথা মেনে চলবেন---এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদা করুন (অর্থাৎ ফরয নামায পড়ুন) এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অতঃপর সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাফিরদেরর নিন্দাও রয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে) তারা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে আগমনকারী এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (সুতরাং দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা সত্যের

দুশমন হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরসন করার জন্য বলা হয়েছে ঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (অতএব, উভয় বিষয় থেকে আল্লাহ্র কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়বস্তুর নির্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কেউ কেউ তো কোরআন থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন স্বস্থানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহ্র অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আল্লাহ্র অভিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুফর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা দাহ্রের অপর নাম সূরা 'ইনসান' ও সূরা 'আবরার'।---(রূহুল মা'আনী) এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هل---هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا

অব্যয়টি আসলে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজ্বল্যমান ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সম্ভাবনাই নেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে---এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাজ্বল্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, قد অব্যয়টি এখানে هل (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। حين শব্দটিকে تنوين-সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে---একথা বলা দুরস্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ মায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত স্তর অতিবাহিত হয়---বীর্য থেকে দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্যও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রষ্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সত্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ভঙ্গিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোন আশংকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন্ বিস্ময়কর অপার শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হুঁশিয়ার, জ্ঞানী, শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود یم و تقاضا ما نبود — لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ---অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। اَمْشَاجٍ শব্দটি مَشَجٌ অথবা مَشِيْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে امشاج বলে রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত---এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে ঃ চিন্তা করলে দেখা যায় উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায় এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে

বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। أمشاج-এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্ববৃহৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্ববৃহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

أمشاج-এর তফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পষ্ট জওয়াব রয়েছে। কারণ, মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি যার জন্য কঠিন হল না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيهِ—এটা ابتلاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এ ভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি, যে কোন পথ অবলম্বন করার। সে মতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا— অর্থাৎ একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়-দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্ব প্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফূরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফূর জান্নাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্য তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফূরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জান্নাতের কাফূর দুনিয়ার কাফূরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফূরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ—عينا শব্দটি كافورا-এর بدل ও হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফূর বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। عباد الله বলে আল্লাহ্‌র সে সব নেক বান্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ابرار বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عينا শব্দটি من كأس-এর بدل হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عباد الله-এর অর্থ হবে ابرار থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ—এতে বিধৃত হয়েছে যে, সৎ কর্মশীল বান্দাগণকে এসব নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نَذْر-এর শাব্দিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জান্নাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব ফরয-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও ফরয কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরয ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েয ও হালাল হওয়া চাই এবং গোনাহ্ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েয কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি ফরয নামায অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামায-রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীয়তে উদ্দিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না ; যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাযার পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا—অর্থাৎ জান্নাতীদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। عَلٰى حُبِّهٖ-এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কেউ বন্দীকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাফির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফাযতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ---দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ঘাড় মোটা হয়ে থাকে---আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জান্নাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতের সব বস্তুর নযীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জান্নাতের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ---زَنْجَبِيل-এর প্রসিদ্ধ অর্থ শুঁঠ। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জান্নাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শুঁঠের আলোকে জান্নাতের শুঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ---اساور শব্দটি سوار-এর বহুবচন। অর্থ কংকন, যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জওয়াব এই যে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দূষণীয় হওয়া---এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দূষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জান্নাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জান্নাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ---অর্থাৎ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বলা হবেঃ জান্নাতের এসব বিস্ময়কর

অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও প্রেমিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, জান্নাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রব্বুল আলামীনের এই উক্তি একদিকে; নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির সনদ বিতরণ করছেন। সাধারণ জান্নাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই মহান নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী কাফিররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আপনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন। এছাড়া দিবারাত্রি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফিরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফিরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসশীল ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ---অর্থাৎ আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

মানবদেহের গ্রন্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা ঃ এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিবারাত্র নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে! এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আশি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।
